মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক-সন্ধান

দীক্ষক দ্রাবিড়

ভূমিকা

ক্ষমতাবান সম্রাটরা আদিকালে নিজেকে ঈশ্বরই দাবি করতেন। জগতে সকল ক্ষমতা যার, প্রশংসা যার একক অধিকার, সিংহাসনে বসে মানব উদ্ধারের ক্ষমতার কল্পিত আস্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা সেই পরাক্রমশালী নৃপতির হতেই পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক জাতি-গোষ্ঠী-দেশে দেশে সম্রাট/রাজাধিরাজরাই ঈশ্বরের চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন। নিরীহ প্রজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজেদের ধন-প্রাণ নিবেদন করেছে সেইসব ঈশ্বরদের পদতলে। কিন্তু মানুষের সাকার দেহ, মরণশীল জীবন, আর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে ঈশ্বরের পদ দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় নি।

তবু বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠীর জন-মানবের উপর ছড়ি ঘুরানোর ক্ষমতা নির্বিঘ্ন রাখতে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ছাড়পত্র ছাড়া চলে কি করে? সুতরাং মানবের ইতিহাসে ঈশ্বরে পুত্র বলে নিজেদের দাবি করা লোকের সংখ্যাও একাধিক। তবে বাঘের বাচ্চার মত ঈশ্বরের বাচ্চা হয়ে ওঠার জৈব প্রক্রিয়া নিয়ে জনমনে সন্দেহের তালমিশ্রি জমাট বাঁধতে থাকলে এ পদ্ধতি ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। তাই খুব বেশি ঈশ্বরের পুত্রকে পায়নি মানব সমাজ।

ক্ষমতার বিপরীত প্রান্তে ছিল নির্যাতিতরা। ক্ষমতাবান শুধু সিংহাসনে বসেই নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করবে আর নিপীড়িতরা হাড়-চামড়া-সার হয়ে কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলবে তাতো হয় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাহস করে ঘুরে দাঁড়ায়। তাদের অবশ্য সিংহাসন নেই রোমান বা মিশরীয় সম্রাটের মত। তারা তাই সম্রাট-ঈশ্বরের বিপরীতে নতুন ঈশ্বর বানানোর কায়দা আবিষ্কার করে। তারা ঈশ্বরের আবাস বানায় শূন্যে। সে ঈশ্বর চোখে দেয়া যায় না, সে ঈশ্বর মানুষের শরীর ধারণ করেন না; তার সিংহাসন মর্ত্যে নয়, তিনি আছেন ঊর্ধ্বলোকে। তিনি শুধু পরাক্রমশালী অশ্বারোহী বাহিনীর নির্দেশদাতা নন, তার নির্দেশে সূর্য ওঠে, তারপর সন্ধ্যা হলে ডুবে গিয়ে আশ্রয় নেয় তার আসনের নিচে। তার আসন এমনই বিশাল, তার ক্ষমতা এমনই বিপুল।

ক্ষমতাবান-ধনাঢ্যদের কাছে পৃথিবীর বিলাসী জীবন বড়, আর বড় সিংহাসনে বসে থাকা প্রতাপশালী সম্রাট। সম্রাটের ক্ষমতায় যে রয়েছে তাদেরও অংশীদারিত্ব। নির্যাতিত-নিঃস্ব-দরিদ্র সহায় সমম্বলহীন মানুষের

পৃথিবীতো নরকবাসের সময়। তারা তাদের স্বর্গ বানায় শূন্যে, সর্বশ্রেষ্ঠত্বের ক্ষমতা আরোপ করে গড়ে তোলে তাদের মূর্তি। কিন্তু মূর্তি গড়ে তুললেই সে মূর্তি শুধু আমার বলে দাবি করা যায় না। ক্ষমতাশালী সম্রাট বরং আরো জোরে-শোরেই সে নতুন মূর্তি স্বত্ব দাবি করতে পারে। সম্রাট তো আর সর্বময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবীর ক্ষমতার সিংহাসনে বসেননি। বরং তিনিই তো নির্বাচিত পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। ঈশ্বর যদি ভালই বাসেন তবে তিনি তার পছন্দের মানুষগুলোকে নিঃস্ব করে বানাবেন কেন? বরং ঈশ্বরের করুণাপ্রাপ্তরা তো ইহ ও পরালোকে সমান ঐশ্বর্যশীল হওয়ার কথা।

কে হে তুমি, নিঃস্ব দরিদ্র, বংশ-গোত্র-নাম পরিচয়হীন ধর্মপ্রচারক? কিসের বলে, কিসের ভিত্তিতে তুমি দাবি করো তোমার সাথে শূন্যের ঈশ্বরের যোগাযোগ? কেন তোমাকে ঈশ্বর নির্বাচিত করবেন? তুমি ক্যাডা?

“আমিই প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বরের কোনো পুত্র-কন্যা নেই। আমি পয়গম্বর। অবিশ্বাসীদের পথে ফেরাতে ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন।” স্বঘোষিত পয়গম্বর বের করেন ঈশ্বরের দেয়া পাথরের খন্ড। এই যে তাতে খোদাই করা ঈশ্বরের দশটি নির্দেশ। নিপীড়িত মানুষরা আশ্বাস পেয়েও যাচাই করে নেয়ঃ

“কিন্তু সম্রাটকে ছেড়ে তোমার ঈশ্বরকে যদি আমরা মেনে নেই তবে কি তিনি সম্রাটের অত্যাচার থেকে আমাদের বাঁচাবেন? সব সময় তোমার সাথে থাকবেন? তোমার ঈশ্বর আবার সম্রাটের দলে ভিড়ে যাবেন নাতো?”

পয়গম্বর কণ্ঠ তীব্র করেন যাতে তাকে সম্রাটের চেয়েও ক্ষমতাশালী মনে হয়। তিনি জানান, ঈশ্বর আমার সাথেই থাকবেন। তেমনই কথা হয়েছে। তার সাথে আমার প্রায়ই কথা হয়। তোমাদের কথাও আমি তাকে জানাতে পারি।

নিপীড়িত মানুষ আশান্বিত হয়। পয়গম্বর সম্রাট না হোক, ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র না হোক, শূন্যের ঈশ্বরের সাথে তার নিয়মিত কথা হয়। তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দেন। “সম্রাটের শোষণ-শাসন থেকে বাঁচবার জন্য এই ‘পয়গম্বর’ত্ব দাবি করা লোকটির ওপর আমরা ভরসা করতে পারি’। সমর্থকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পয়গম্বর তাদের আশার কথা শোনান, আশ্বস্ত করেন। কিন্তু তারা প্রশ্ন তোলে, তুমি কি তোমার ঈশ্বরকে দেখেছ? পয়গম্বর এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শূন্যের ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে তিনি জানান, ঈশ্বর আমাকে দেখা দিয়েছেন।

“ঈশ্বর আপনাকে দেখা দিয়েছেন! তাহলে সত্যি সত্যি আকাশে ঈশ্বর আছেন। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন সম্রাটের অবিচার থেকে!”

“নিশ্চয়ই তিনি তা করবেন। তার সাথে আমার তেমনই কথা হয়েছে।”

যাদের কিছুই ছিল না, না ধন, না ক্ষমতা, না সাহস, না রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা তারা অকস্মাৎ সব পাওয়ার খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাদের সাথে আছে শূন্যের ঈশ্বর। সে ঈশ্বরের পতাকা নিয়ে তারা খালি হাতে, নাঙা (নগ্ন) পায়ে, উদোম বুকে লড়াই করবে সম্রাট ঈশ্বরে বিরুদ্ধে। তাদের সাথে থাকবেন শূন্যের ঈশ্বর আর তার অদৃশ্য দেবদূতগণ।

পয়গম্বরের গাল-গল্পে বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। কিন্তু আর সব সাধারণ মানুষের মত মানুষ পয়গম্বর তার শূন্যের ঈশ্বর আর দেবদূতের সাহায্য নিয়েও নিঃস্বদের নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটাতে পারেন না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ পয়গম্বর জন্মাতে থাকে আরবের ঊষর ভূমিতে। নিজেকে পয়গম্বর দাবি করা তখন তরুণ আরবদের হাল ফ্যাশন। আজকাল যেমন তরুণরা মডেল সাজে, নায়ক হয়, তখন যুবারা হতো পয়গম্বর (ব্যতিক্রম আছে একালের নায়কদের মধ্যে, নায়করাও কেউ কেউ পয়গম্বর হতে চান, যেমন হলিউডের টম ক্রুজ)।

কিন্তু পয়গম্বর হওয়ার তরিকা কেউ কাউকে জানান দেন না। না ঈশ্বর তার ঐশিগ্রন্থে না পয়গম্বর তার বাণী ও নির্দেশে, কোনভাবেই জানা যায় না, কী প্রকারে একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে পয়গম্বর, নবী, প্রেরিত পুরুষ। কি যোগ্যতায় সে পেয়ে যায় আকাশের ঈশ্বরের লেখা বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণ?

কী প্রকারে মেষের রাখাল, গোয়াল-নন্দন শুধু নিজের উচ্চারণের জোরেই, শুধু নিজের সাক্ষ্যেই হয়ে যান পয়গম্বর। মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে উঠার পদ্ধতিটা না জেনে পয়গম্বরকে ‘রূপকথার রূপকার’ বলা যায় না কিছুতেই। প্রশ্ন তাই, তরিকাটা কী?

আদিম সমাজে পয়গম্বর

আদিম সমাজগুলোতে নির্যাতিতদের কেউ একজন প্রতিবাদ করে উঠতো। তার জাতি-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতো, শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নতুন ধর্মের ডাক দিতো। সেই সাহসী মানুষ অস্বীকার করতো শাসকের ধর্মকে। নিজেকে সম্পর্কিত করে তুলতো ঈশ্বরের সাথে; হয় ঈশ্বর-পুত্র নয় পয়গম্বর হিসেবে দাবি করতো নিজেকে। পয়গম্বরদের ইতিহাসগুলোর সরলীকরণ করলে এই আমরা পাই। এ কথাগুলোই ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই সরলীকরণে অনেকেই আপত্তি করবেন। কতটা ইতিহাস সিদ্ধ এ প্রস্তাবনা?

সমস্যা এই ইতিহাসেই। ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়? কে লিখবে ইতিহাস? ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ১৯৯১-তেই পাওয়া যায় নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য। আর পৌরাণিক ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ধারণ করার উপায় কী? প্রধান প্রধান পয়গম্বরদের সত্যিকার ইতিহাস পাওয়া দুরূহ (ড্যান ব্রাউনের দ্য ভিঞ্চি বা জন ক্যামেরনের কফিন আবিষ্কারের কথা ভাবুন)। এসব ইতিহাস থেকে পয়গম্বরদের উত্থানকে বুঝতে গেলে সমস্যা দেখা দেয় অন্ততঃ তিন রকমের; ক) অনুসারীরাই মূলতঃ পয়গম্বরের জীবনেতিহাসের প্রথম বয়ানকারী। সুতরাং সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট, ফোলানো-ফাঁপানো, মিথিক্যাল। খ) অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর পক্ষে এসব ইতিহাস সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। সঠিক ঐতিহাসিক বয়ান পাওয়া যায় না, জবাব পাওয়া যায় না অনেক প্রশ্নের, একারণেই। গ) পরবর্তীকালে আসা অন্য কোনো ধর্মের ষাঁড়দের দ্বারা বা পরাক্রমশালী সম্রাটের বাহিনীর দক্ষযজ্ঞে ইতিহাসের অনেক চিহ্নই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং পয়গম্বরদের প্রকৃত জীবনী এখন আমরা আর ঠিকঠাক জানতে পাই না।

সুতরাং মানুষের পয়গম্বর হওয়া বুঝতে এমন একজনকে বেছে নেয়া উচিত যার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষ-বিপক্ষের অনেকগুলো সূত্র থেকে তার তথ্য যাচাই করা যায় এরকম একজন পয়গম্বরকে এখানে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই। কয়েকটি কারণে এই উদাহরণ আমাদেরকে পয়গম্বরত্ব লাভ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেবে:

এই পয়গম্বর আধুনিককালের হলেও অনগ্রসর সমাজের সদস্য। বর্তমান সময়ের অনগ্রসর সমাজের মানুষের আচার-আচরণ থেকে আমরা সহজে সভ্যতার ঊষালগ্নের মানুষের সমাজব্যবস্থা একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

আধুনিক সময়ের বলে তার সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি নেই।

পয়গম্বর হিসেবে তিনি তার সমাজ-জাতিকে কাংক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারেননি। পয়গম্বর হিসেবে তার এই ব্যর্থতা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ২/৩টি ধর্ম বাদে বাকী বিপুল সংখ্যক ব্যর্থ পয়গম্বরদের সম্পর্কে অনুমান করতে সাহায্য করবে।

পয়গম্বরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমাদের আলোচ্য এই পয়গম্বর জন্মেছিলেন উত্তর আমেরিকায়। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকের কথা। ইউরোপ থেকে সাদা চামড়ার লোকেরা দলে দলে এসে তখন দখল করে নিচ্ছে উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। পয়গম্বরের জাতির জন্য নেমে এসেছে চরম দুর্দিন। তারা তখন বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, দলাদলিতে লিপ্ত, কেউবা ইউরোপিয়ানদের দালালিতে রত। ইউরোপিয়ানদের আনা মদ ও সস্তা চাকচিক্যময় ভোগ্যপণ্যের মোহে পড়ে (রেড) ইন্ডিয়ান জাতির অনেকেই তখন বিভ্রান্ত। সাদা চামড়ার লুটেরাদের হাতে তখন তারা নির্যাতিত হচ্ছে, আটকা পড়ছে, হয়ে পড়ছে দাস। এসময় রেড ইন্ডিয়ানদের মাঝে একজন জেগে উঠলেন, তার নাম টেকুমসে। তিনি বললেন, “মহান ঈশ্বর হচ্ছেন আমার পিতা। এই মাটির পৃথিবী আমার মা”। তিনি বললেন, এই মাটি সমষ্টিগতভাবে সব রেড ইন্ডিয়ানদের সম্পত্তি। একক কোনো মালিক নেই এই মাটির। কেউ চাইলেই ব্যক্তিগতভাবে এর কোনো অংশ বিক্রি কররে পারে না। টেকুমসে’র এই ঘোষণা উপনিবেশকারীদের রাষ্ট্রদখলে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধ লাগলো সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানদের সাথে ভূমিপুত্রদের।

টেকুমসে’ এখানে নির্যাতিত মানুষের নেতা, সাহসী যোদ্ধা। যদিও তিনি ঘোষণা দিয়েছেন পরম ঈশ্বরের তিনি পুত্র তবু তিনি পয়গম্বর ছিলেন না। তেমন দাবিও তিনি করেননি।

পয়গম্বর ছিলেন টেনসকাওয়াতাওয়া (তার নামের মানে, যিনি দরজা খুলে দেন, ‘হি হু ওপেন্স দ্য ডোর’।) তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা টেকুমসে’র ছোট ভাই। টেনসকাওয়াতাওয়া (১৭৭৮-১৮৩৭) ছিলেন শাওনি নৃগোষ্ঠীর সদস্য। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা অবশ্য তার চরিত্রে নানা কালি-ঝুলি মাখিয়েছেন। তাকে চিহ্নিত করেছেন ভন্ড, প্রতারক, মাতাল হিসেবে। তবে সব পয়গম্বরদের ক্ষেত্রেই এরকম মানহানির আর ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটেছে। তার জীবনী পাঠ করলে মানুষ কীভাবে পয়গম্বর হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবো। এই পাঠ থেকে আমরা এও বুঝতে পারবো আদিকালে কেন গন্ডায় গন্ডায় জন্ম হতো পয়গম্বর আর আত্মার।

টেনসকাওয়াতাওয়ার মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে ওঠাটা খুবই মিথিক্যাল। একবার কিছু লোক তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। তারপর তিনি মারা গেছেন ভেবে তাকে ফেলে যায়। পরদিন চেতনা ফিরে পেয়ে টেনেসকাওয়াতাওয়া জানালেন যে, মৃত্যুর পর দেবদূতরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর তার হৃদপিন্ড খুলে পরিষ্কার করে তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নবীন পয়গম্বর তখন আহ্বান জানালেন রেড-ইন্ডিয়ান জাতির ঐক্যের। বললেন সাদারা হচ্ছে শয়তান, ওদের সমস্ত আচার-আচরণ শয়তানী, ওদের হুইস্কি শয়তানের পানীয়। যারা সাদাদের দলে গেছে তাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন তিনি। তারপর তিনি নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করলেন।

কিন্তু তার বেশিরভাগ জাতভাইরাই তাকে বিশ্বাস করলো না। তারা তাকে বিকৃত মস্তিষ্ক হিসেবে চিহ্নিত করল। তাকে মিথ্যাবাদী, পাগল ও অসৎ বলে গালাগালি করল। অবিশ্বাসীদেরকে পয়গম্বর তখন একটা যুদ্ধ করার লাঠি দেখিয়ে তা মাটি থেকে তুলতে বললেন। বিখ্যাত যোদ্ধা বড়ভাই টেকুমসে সেই লাঠি মাটি থেকে উঠাতে ব্যর্থ হলেন। তারপর একে একে গোত্রের সবাই যখন সেই লাঠি তুলতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা মেনে নিলো টেনসকাওয়াতাওয়া ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। পয়গম্বর তখন কানাডা থেকে শুরু করে মেক্সিকান উপসাগর পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার বিরাট অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত রেড-ইন্ডিয়ান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশনা দিলেন। তাদেরকে জানালেন ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ।

পয়গম্বর ও তার যোদ্ধা বড় ভাই মিলে ফোর্ট গ্রিনভিলে সাদাদের প্রভাবমুক্ত এক শহরের পত্তন করলেন। যার নাম হলো পরবর্তীতে 'প্রফেটস্ টাউন'। পয়গম্বরের নগর। তিনি তখন রেড-ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন, সেগুলোকে সাদাদের শয়তানীমুক্ত করছেন ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী, আর দলে দলে রেড-ইন্ডিয়ানরা তার ধর্ম বরণ করে নিচ্ছে। ইন্ডিয়ানার গর্ভনর উইলিয়াম হ্যারিসন (পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট) পয়গম্বরের এই অগ্রযাত্রায় প্রমাদ গুণলেন। কারণ পয়গম্বর ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন ইন্ডিয়ানা, ইলিওনয়, মিশিগান ও উইসকনসিনে যে ভূমি কিনেছেন বলে গর্ভনর দাবি করছেন তা ধর্মবিরুদ্ধ।

গর্ভনর তখন দেশবাসীকে হুশিয়ার করে সংবাদ পাঠাতে শুরু করলেন যে, টেনসকাওয়াতাওয়া একজন জোচ্চোর, প্রতারক, একজন ভন্ড পয়গম্বর। ডেলওয়ারের অধিবাসীদের পরামর্শ দিলেন হ্যারিসন যে, টেনসকাওয়াতাওযা যদি সত্য পয়গম্বর হবেন, তবে কোথায় তার স্বর্গীয় ক্ষমতা।

"তাকে বলো যে, তার ক্ষমতা থাকলে সূর্যকে থামাতে, চাঁদের গতি পরিবর্তন করতে, নদীর স্রোতধারা বদলে দিতে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলতে। তবেই না মানবো সে সত্যিকার পয়গম্বর।"

হ্যারিসনের এই চ্যালেঞ্জে দমে গেলেন না টেনসকাওয়াতাওয়া। তার ভাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন তাকে। পয়গম্বর শুধু আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে বললেন, সদাপ্রভু তুমি তোমার ধর্মকে জয়ী করো। তোমার পয়গম্বরকে জয়ী করো। তারপর পয়গম্বর হ্যারিসনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। পয়গম্বর জানালেন ১৮০৬ সালের ৬ জুন তারিখে তিনি সূর্যকে গ্রিনভিলের আকাশে থামিয়ে দেবেন।

যার নির্দেশে সূর্য থেকে গেল আকাশে

পয়গম্বরের জানানো তারিখ ও সময়ে বিপুল সংখ্যক জনতা জড়ো হলো পয়গম্বরের ঐশি ক্ষমতা নিজ চোখে দেখতে। পয়গম্বরের ইশারায় সূর্য থেমে গেলো আকাশে। গ্রিনভিলের মানুষেরা দেখলো এক নাটকীয় সূর্যগ্রহণ। পয়গম্বরের সত্যতা নিয়ে রেড-ইন্ডিয়ানদের আর কারো মনেই কোনো সন্দেহ রইলো না। তার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো, সাথে ধর্মানুসারীদের সংখ্যা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সাদা বাসিন্দারা সন্দেহ প্রকাশ করে বললো, কোনোভাবে টেনসকাওয়াতাওয়া আগেভাগে জেনে গিয়েছিলেন সূর্যগ্রহণের কথা। তার এসবই ভন্ডামি। কিন্তু দলে দলে তীর্থযাত্রীরা আসতে শুরু করলো পয়গম্বরের গ্রামে। আর তিনি তার ঐশি ক্ষমতায় তাদের রোগ-শোক দূর করে দিতে থাকলেন মুর্হূতের মধ্যে।

ঈশ্বরের নির্দেশে পয়গম্বর তার জাতিকে আলো ও সত্যের পথ দেখান। সাদাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে তিনি ও তার বড়ভাই সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু ১৮১৩-তে টেমসের যুদ্ধে যখন বড়ভাই টেকুমসে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যারিসনের হাতে নিহত হলেন তখন মনোকষ্টে পয়গম্বর তার অনুসারীদের নিয়ে হিজরত করলেন কানাডায়।

অন্যদিকে হ্যারিসন ১৮৪০-এ নির্বাচিত হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাতে কি? পয়গম্বরের অভিশাপ তো ছিলই। দায়িত্বগ্রহণের মাত্র একমাসের মধ্যে পরাক্রান্ত সেনাপ্রধানকে আক্রমণ করলো সামান্য ঠান্ডাজ্বর এবং তাতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি ক্ষমতায় থাকতেই মারা যান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পয়গম্বরের অভিশাপ (!) বিশ বছর পর পর আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা এভাবে ক্ষমতায় থাকতেই দেখলেন মৃত্যুর মুখ। ১৮৬০/১৮৮০/১৯০০/১৯২০/১৯৪০/১৯৬০ এই বছরগুলোতে নির্বাচিত হওয়া প্রেসিডেন্টরা গদিতে থাকতেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৮০-তে রোনাল্ড রিগ্যান যখন আততায়ীর গুলি খেয়েও বেঁচে গেলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রবাসী হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলো এই বলে যে পয়গম্বরের অভিশাপ থেকে হয়তো মুক্তি পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র!

প্রেসিডেন্ট হ্যারিসনের মৃত্যুর আগেই দেশে ফিরে এসেছিলেন পয়গম্বর। ১৮৩৭-এ তার তিরোধানের আগে তিনি বিশ্বাসীদের শুনিয়ে গেছেন ঈশ্বরের আশ্বাস বাণী।

“অবশ্যই একদিন পয়গম্বরের মাতৃভূমি মুক্ত হবে সাদাদের শোষণ-শাসন থেকে”। পয়গম্বরের তিরোধানের পর তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরো অনেকে নিজেদের ঐশি ক্ষমতার কথা দাবি করেছে। কিন্তু তারা কেউ জাতিকে মুক্তি এনে দিতে পারেননি, ঐক্যবদ্ধও করতে পারেননি।

পয়গম্বর ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, তারপর এক মহিলা নবী আসবেন, কিন্তু তাকে হত্যা করা হবে। এবং একজন বালক নবী আসবেন এবং রেড-ইন্ডিয়ান জাতির উচিত সেই বালক নবীর কথা শোনা। তার অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হয়েছে। তিনি বলেছিলেন হটকাগারা উপজাতি তাদের মুখের ভাষা লিখতে সক্ষম হবে। পরে তা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন বৃক্ষ তার শেকড় থেকে মুক্ত হবে এবং পৃথিবী ভ্রমণ করবে। যেদিন তার জাতভাইরা দেখলো পাহাড়ের বৃক্ষকে মানুষ শেকড় থেকে আলাদা করছে এবং ট্রেনে বা জাহাজে করে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে সেদিন তারা বেদনায় অশ্রু ফেললো। তাদের পয়গম্বর কত প্রজন্ম আগে তাদেরকে এসব কথা আগাম জানিয়ে গিয়েছিলেন।

তাদের পয়গম্বরের বাকী কথাগুলোও সত্যে পরিণত হবে এই আশায় এখনও বুক বেঁধে আছে রেড-ইন্ডিয়ান জাতির বিশ্বাসীরা। এখনও তারা ছোঁয় না সাদাদের হুইস্কি, প্রেমে পড়ে না সাদা নারীর। ঘরে পোষে না সাদাদের আনা ইউরোপের কুকুর ও বেড়াল। এখনও তারা স্বপ্ন দেখে বালক নবীর। যে তাদের মাটিকে স্বাধীনতা এনে দেবে, মুক্ত করবে সাদা দস্যুদের হাত থেকে।

না-দেখা ঈশ্বরকে অস্তিত্ব দিয়েছেন পয়গম্বররা

মানুষের কখনও না-দেখা ঈশ্বরকে অস্তিত্ব দিয়েছেন পয়গম্বররা। তারা দাবি করেছেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি - চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, সাগর, বাতাস, রোগ-জীবাণু, এমনকি শয়তান ও ভূত-প্রেত- এবং যদিও সৃষ্টিগুলোকে আমরা দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি, তবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে পয়গম্বর লাগে। মানুষ একা একা পারে না। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি পারে না, মানুষের বিজ্ঞান পারে না। কোনো কোনা মানুষ শুধু পয়গম্বর হয়ে ওঠে আর তাদের সাথে ঈশ্বরের দেখা হয়ে যায়, কথা হয়ে যায়। আমরা পয়গম্বরে আস্থা এনে পুরনো জপমালা বদলে বাজার থেকে কিনে আনি নতুন ধরনের তসবিহ।

ঈশ্বর তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে কতিপয় পয়গম্বর ছাড়া - কাউকে গ্রন্থসহ, কাউকে গ্রন্থছাড়া, বেশি কিছুই পৃথিবীতে পাঠাতে পারেন না। সেসব পয়গম্বররা, কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করে দেওয়ার, চাঁদকে আঙুলের ইশারায় ভাগ করে দেয়ার, সূর্যকে মাঝ আকাশে থামিয়ে দেয়ার, সাগরের মাঝ বরাবর পথ করে হেঁটে যাওয়ার, দেবদূতের সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশে উড়াল দেয়ার, বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রমাণ দেখান পৃথিবীতে। ঈশ্বর তার ক্ষমতার, তার অস্তিত্বের তেমন প্রমাণ দেখাতে পারেন ততটা যতটা পারেন পয়গম্বররা। ইতিহাস তো তাই বলে। কিছু অনুসারীরা হয়তো দেখে, তবে অধিকাংশ লোক না দেখেই, পয়গম্বরের ক্ষমতার বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তার ধর্মকে, তার ঈশ্বরকে, তার গ্রন্থকে বিশ্বাস করে। তারপর কবুল করা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবী জুড়ে ভিন্নধর্মেও, বিধর্মীদের মু-ুপাত করে।

পয়গম্বর মুসা তার জাতিকে জানান যে, পাহাড়ে তার সাথে ঈশ্বরের কথা হয়; ঈশ্বর যদি তার সাথে কথা কইতে পারেন তবে অন্যের সাথে কইতে অসুবিধা কী? অতঃপর অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বৃষ্টি-বাদলের রাতে ঈশ্বর নবী মুসাকে দেখা দেন - ঈশ্বর আগুনের তৈরি, তাই পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন কি শুধু মুসাই দেখতে পেতেন সেই কালে, আর কেউ পেত না? তবে ঈশ্বর সেই কালেও আর কারও সামনে আসেন না। দুই খন্ড পাথর দেন তিনি নবী মুসাকে। সেই পাথর খ-ে ঈশ্বর নিজ হাতে লিখে দেন দশটি নির্দেশনামা। একটি পাথর ভেঙে যাওয়ার পর ঈশ্বর আবার নতুন করে মুসাকে আরেকটি পাথর দেন। সেসব গল্প আমরা শুনি। কিন্তু পাথর খন্ডগুলো আর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাই না। ঈশ্বরের চাঁদ, ঈশ্বরের সূর্য তেমনই আছে, কিন্তু তার স্বহস্তলিপি, তার নির্দেশনামা লেখা পাথরখন্ড দু'টি পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যায়, কি বিস্ময়কর।

যেসব মানুষ এরকম পয়গম্বর হয়ে ওঠেন, তাঁরা ঈশ্বরের সাথে তাদের সোল এজেন্সির এমন সব গল্প-গাঁথা ছড়িয়েছেন, তা শুনে আমরা শিহরিত হই, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারি না। ঈশ্বর কি তবে শুধু পয়গম্বরদের? কেন ঈশ্বর মানুষের কাছে আসতে পারেন না, জনে জনে নির্দেশ নামার পাথর বিলোতে পারেন না, দেশে দেশে পাহাড়ে পাহাড়ে এসে উঁকি দিয়ে যান না।

পয়গম্বরদের গাল-গল্পের সাথে এই যে আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি মেলে না সে দোষ কার? ঈশ্বরের, নাকি মানুষ থেকে রূপান্তরিত পয়গম্বরের। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন নি, যেহেতু পয়গম্বররাই বিভিন্ন দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেহেতু দায়ভার মানুষের পয়গম্বরদের ওপরই বর্তায়। তবু জরুরি প্রশ্নটাই পয়গম্বরদের করা হয় না:

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তবু মানুষের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরতে কেন তার পয়গম্বর লাগে?

অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি

পয়গম্বররা মানুষ। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ মানুষের আকার-আকৃতির প্রাণীর জন্ম দিতে পারে, এর কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। পয়গম্বররা মানুষের গর্ভে ইম্পল্যান্ট করা ভিনগ্রহের কোনো প্রাণীর ভ্রুণ এমনটিও জানা যায়নি। সোজা কথায়, তারা অতি-অবশ্যই মানুষ, পুরুষের ঔরসে নারীর গর্ভে হওয়া রক্তমাংসের মানুষ। তাদের নামে কিছু অলৌকিক কাহিনী চালু আছে। যা মানুষরা করতে পারে না বলেই আমরা জানি। তবে তেমন গল্প আমরা সাম্প্রতিককালে উত্তরা-টঙ্গির বালক পীরের ক্ষেত্রেও শুনেছি। সাভারের মহিলা-পীরের ক্ষেত্রেও নানা অসম্ভব ঘটনা ঘটানোর গুজব চালু আছে। সেসব নেহায়েত গুজব, অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে পড়ে তার কোনো ভিত্তি-প্রমাণ নেই।

কিন্তু মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে ওঠার পথে তারা নিজেরা এমন কিছু দেখার ও শোনার দাবি করেন যা তাদের চারপাশের মানুষ দেখতে ও শুনতে পায় না। যেমন আমরা মুসা নবীর কাছ থেকে শুনতে পাই যে তার মাথায় কেউ কথা বলে অবিরাম। কিন্তু আশে-পাশের কেউ সেসব কথা শুনতে পায় না। নবীদের কাছ থেকে আমরা জানি ভরাট আসরে জিব্রাইল এসে দাঁড়ায়, তাদেরকে ওহি দেয়, কিন্তু আসরের অন্য কেউ জিব্রাইলকে দেখতে পায় না তার দেখা ওহি'ও কেউ শুনতে পায়না। অশরীরি অস্তিত্বের সাথে পয়গম্বরদের যোগাযোগের, কথোপকথনের ও লেন-দেনের এমন কিছু অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও অপ্রমাণযোগ্য গল্প আমরা শুনেছি। তারা এসব মিথ্যা করে বা বানিয়ে বলেছেন এমন মনে হয় না।

নবী পয়গম্বরদের বর্ণনায় বোঝা যায়, তারা যা বলেছেন তা তারা নিজেরা বিশ্বাস করেন ও অন্যদের বিশ্বাস করাও জরুরি বলে মনে করেন। এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন ধর্ম চালু হয়ে যায় এবং যারা এসবে বিশ্বাস করে না তারা অবিশ্বাসী বা বিধর্মী ঘোষিত হয়। পয়গম্বরদের এইসব মানব-অসম্ভব কার্যকলাপকে মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির আলোকে অস্বাভাবিক বা অ্যাবনর্মাল মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনে হয়[1] ।

পয়গম্বরদের মনের তিন ধরনের বিশেষ অবস্থা লক্ষণীয়। যা তাদেরকে মানুষ থেকে আলাদা করে তোলে: (ক) অনুপ্রেরণা: মানসিক উত্তেজনার এমন একটা স্তর যখন বাস্তব সমস্যা-অসুবিধাগুলো নিয়ন্ত্রণ মন অস্বীকার করে, (খ) এক্সট্যাসি বা উদভ্রান্তের মত উদ্বেলিত অবস্থা: যখন বাস্তব হিতাহিত জ্ঞান কিছুক্ষণের জন্য লোপ

[1] জার্নাল অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড হেলথ ভ: ১৩, নং:৩ পৃষ্ঠা ১৯৪-২০০

পায়, (গ) দৃষ্টি ও শ্রবণ বিভ্রম: স্বপ্ন বা বিভ্রমের শিকার হয়ে নিজের কল্পনার মত দৃশ্য দেখতে পাওয়া ও কথা শুনতে পাওয়া।

ছোটবেলা থেকেই যে কোন সাধারণ মানুষকে শেখানো হয় পয়গম্বরদের মত আদর্শ মানুষ হতে। কিন্তু কী সেই উপায়? মন ও চিন্তার কোন স্তরে মানুষ হয়ে ওঠে পয়গম্বর। সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা কঠিন, কিন্তু এর উত্তর জানাটা জরুরি।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, মনের বিশেষ অবস্থার কারণেই কি একজন মানুষ অতি-মানুষ, মহা-মানুষ, বা পয়গম্বর হয়ে ওঠেন, অথবা হয়ে উঠেছেন বলে নিজের মনে বিশ্বাস করে?

নবী ইজিকিয়েল ও এপিলেপ্সি

বহু আগে থেকেই মনোবিজ্ঞানীরা কিছু পয়গম্বরদের অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। এ বিষয়ে সবচে বেশি গবেষণা হয়েছে নবী ইজিকিয়েলকে নিয়ে। নবী ইজিকিয়েল প্রায় ২৬০০ বছর আগে বাইবেলের 'ইজিকিয়েলের বই' অংশটুকু লিখেছেন। সানডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটির নিউরো সাইন্সের অধ্যাপক এরিক আলটশুলার বলেছেন ইজিকিয়েল হচ্ছেন এপিলেপটিক রোগীর ক্লাসিক্যাল উদাহরণ[2]। বাইবেলে বর্ণিত উদাহরণ থেকেই অধ্যাপক এরিক জানাচ্ছেন, ইজিকিয়েল যে ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে পড়তেন বা তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যেত, এগুলো হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের (টেম্পোরাল লোব) এপিলেপ্সির (মৃগী রোগ) লক্ষণ। যারা এরকম ঘন ঘন মুর্চ্ছা যান, তারা সবসময় এরকম দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা মানুষের মত আগে-পাশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতে থাকেন।

ইজিকিয়েল নিজের মাথার ভেতর ঈশ্বরের নির্দেশ শুনে ডান পাশে কাত হয়ে শুয়েছিলেন ৩৯০ দিন তারপর পাশ ফিরে শুয়েছিলেন আরো ৪০ দিন, মানুষের বিষ্ঠা দিয়ে তার খাবার রান্না করেছিলেন, নিজের বাড়িতে গর্ত করে তার ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন গজবের ভয়ে (ইজিয়েল, ৪:৯)। ধর্মবেত্তারা অবশ্য ইজিকিয়েলের এসব কর্মকান্ডকে সিম্বলিক ও ঈশ্বরের রহস্যময়তা বলে ব্যাখ্যা করার একটা চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু নিউরোটিক, নিউরোটিকই, সে নেপোলিয়নই হোক, জুলিয়াস সিজারই হোক আর নবী-পয়গম্বরই হোক।

নবী ইজিকিয়েলের মধ্যে এপিলেপ্সির রোগের অন্যান্য লক্ষণও দেখা গেছে। যেমন তিনি বাতিক গ্রস্তের মত লিখতেন শুধু লিখতেন। যাকে বলে হাইপারগ্রাফিয়া। তাছাড়া আগ্রাসী ধরনের ধার্মিক ছিলেন ইজিকিয়েল। ডিলিউশন, ধর্মের বিষয়ে আগ্রাসী মনোভাব ছাড়াও এই ধরনের মৃগী রোগের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ বিষয়ক বক্তৃতাবাজি করা। ইজিকিয়েলের এই সবকিছুই ছিল বলে জানিয়েছেন প্রফেসর

[2] নিউ সাইন্টিস্ট, ১৭ নভেম্বর ২০০১

এরিক। নিউরোসাইন্সের এই তত্ত্ব প্রমাণের পর ইজিকেয়েলের বই পড়তে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাহলে এসব ধর্মগ্রন্থ রচনার নতুন একটা অর্থ ধরা পড়বে।

ইজিকিয়েলের মত অনেক পয়গম্বরের ক্ষেত্রেই সাইকোটিক, এপিলেপটিক, সিজোফ্রেনিক, অথবা হিস্টেরিক এসব অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের নিউরোটিকের কাছ থেকে শোনা ধর্মকথার সারবত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গবেষকরা। তাই মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সন্দেহের চোখেই দেখেন নিউরোসাইন্সের লোকজন। তাদের অনেকেরই মতামত ধর্ম মূলত: নিউরোসিস ও পলায়নপর মনোবৃত্তির ফসল[3]।

সাইকোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে আমরা পয়গম্বরদের প্রফেসির রহস্যের একটা সমাধান পাই। তাদের অস্বাভাবিক সব দাবি আর অসম্ভব সব বিশ্বাস, অদ্ভুত সব শব্দ বা কণ্ঠ শোনা, অবিশ্বাস্য সব দৃশ্য দেখার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ থেকে। সরাসরি পরীক্ষা করার মত নবী-পয়গম্বর হাতের কাছে এখন পাওয়া কঠিন। তবে মানসিক হাসপাতালের রোগীদের আচরণ থেকে যেটুকু বোঝা যায় তাতে সন্দেহ নেই সাইকোলজির ব্যাখ্যা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

তবে কি পয়গম্বরত্ব একধরনের মানসিক ব্যাধি? শ্রুতি ও দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার মানুষের বাস্তবতাবর্জিত কল্পনার প্রকাশ।

পয়গম্বররা কি সিজোফ্রেনিক?

নবী ইজিকিয়েলের অস্বাভাবিক সব কাজকর্মের কথা আগের পর্বে বলা হয়েছে। যা থেকে নিউরাসাইন্সের গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি এপিলেপ্সিতে ভুগছিলেন। অন্যান্য নবীদের আচার-আচরণের বর্ণনা ও নিজের ঢোল-কীর্তন পড়ে অনুমান করা যায় যে আজকের পৃথিবীতে বাস করলে তাদেরকে আমরা মানসিক ব্যাধি হাসপাতালেই পাঠাতাম। এ বিষয়ে সাওনি পয়গম্বরের উদাহরণটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

পয়গম্বরদের কালে এসব মানসিক রোগের আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু রোগটা ছিলো। অনেক জাতি-গোষ্ঠীতেই এরকম আচরণকে অশরীরি আত্মা ভর করা, আছর হওয়া হিসেবেই দেখতো। এখনও পৃথিবীর অনেক

[3] জার্নাল অব বাইবেল এন্ড রিলিজিয়ন, ভলিউম-২১, নং-৪, পৃষ্ঠা ২৪৪

পিছিয়ে পড়া জনপদে সিজোফ্রেনিক লোকদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লোক বলেই মানুষ মানে (বাংলাদেশেও উদাহরণের অভাব হবে না)।

পয়গম্বরদের আচার-আচরণ বা জীবন ইতিহাস আমরা ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থে পাই। তারা সিজোফ্রেনিক ছিলেন কি না বা থাকলে কতটা সিজোফ্রেনিক ছিলেন তা বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার সিজোফ্রেনিয়া অসুখটা কী?

একটা সাধারণ ধারণা আছে সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভোগা লোকজনের দ্বৈত বা বিভক্ত (ডাবল বা স্প্লিট পার্সোনালিটি) রয়েছে। অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। তবে এ এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ বিষয়। অন্যদিকে, সিজোফ্রেনিয়ার মত মানসিক অবস্থাগুলোকে সাইকোসিস বলে। সাইকোসিস মানে হচ্ছে এতে আক্রান্ত হলে মানুষের বাস্তব-অবাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। তবে ঐ ব্যক্তি যে সবসময় অবস্তাব কথাবার্তা বলবে বা আচরণ করবে এমন নয়, তার ঐ সাইকোসিস অল্প কিছু সময়ের জন্যও হতে পারে। বাকী সময় সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে।

একটি মানুষ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত কি তা নিচের লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায়। সবার মধ্যেই একসাথে সব ক'টি লক্ষণ থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আক্রান্ত হওয়ার মাত্রার উপর নির্ভর করবে কয়টি লক্ষণ বা লক্ষণের প্রাবল্য।

১: হ্যালুসিনেশন: একে বলা যায় ভুল দেখা। এ অবস্থায় মানুষটি যা দেখছে বলে ভাবছে তা আসলে ঠিক নয়। "সর, সর, আমার চোখের সামনে থেকে সর"-এ কথা রাস্তার পাগলদের বলতে আমরা দেখি। এই বলে আজো ওঝারা জিন্-ভূত তাড়ায়। এই কথা বলেই পয়গম্বররা শয়তান তাড়াতেন। আবার অনেকেই দৃষ্টি বিভ্রমে ঘুম থেকে ওঠে ভোর বেলা আকাশের সমান লম্বা দরবেশ দেখে, ফেরেশতা দেখে, বিভ্রান্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে সেই দৃশ্যবস্তুকে অনুসরণ করে হারিয়ে যায়।

২: কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া: সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত মানুষ সব সময় শুনতে পায় তাদের মাথার ভেতর কে যেন কথা বলছে। আমি একজনকে চিনি যে, প্রযুক্তি-পছন্দ করতো বলেই হয়তো, আক্রান্ত হওয়ার পর বলতো স্যাটেলাইটের সব টিভি চ্যানেলের কথা সে তার মাথার ভেতর শুনতে পায়। তবে অন্য মানুষরা এসব শব্দকে বাস্তব মানুষের, অশরীরি আত্মার, ফেরেশতার, বা ঈশ্বরের বলে মনে করে। একসাথে কয়েক ধরনের

কণ্ঠস্বর শোনে এরা। কোনো কণ্ঠস্বর থাকে শয়তানের, কোনোটা বা ঈশ্বরের, কোনোটা স্বর্গীয় পিতা বা নবীর। শয়তান মাথায় কুবুদ্ধি দেয়, বলে অমুককে হত্যা কর, তমুককে ধর্ষণ কর, ওর কান কেটে ফেল। আবার ঈশ্বর আশ্বাস দেন যে, তুমিই আমার প্রতিনিধি, নিশ্চয়ই সব মানুষ একদিন তোমার কথা শুনবে।

৩: ডিলিউশন: ভ্রান্ত বিশ্বাস। এরকম লোক মনে করে সে উত্তম কুমার - টালিউডের নায়ক, তার বিশাল ক্ষমতা আছে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার, সে ভবিষ্যতের নেতা-প্রেসিডেন্ট। এরকম ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকেই মানুষ ভাবে সে পয়গম্বর, ঈশ্বর তাকে বাছাই করেছেন পাপ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে।

বিভিন্ন রকমের ডিলিউশনে মানুষ ভুগতে পারে। তবে এর মূল কথা হলো সে নিজেকে এমন একটা কিছু বলে বিশ্বাস করে যার সাথে বেশিরভাগ যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একমত হয় না।

কিছু উদাহরণ: খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সেইন্ট পল বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি "ঈশ্বরের এক মিশনে আছেন" কারণ তিনি সেরকম এক 'দৃশ্য' দেখেছেন। বিটলসের গায়ক জর্জ হ্যারিসনকে চাকু মেরেছিলো যে আব্রাম, সেও ভাবতো, সে "ঈশ্বরের এক মিশনে আছে" [4]।

অস্কার পাওয়া মুভি "দি বিউটিফুল মাইন্ডে" রাসেল ক্রো অভিনয় করেছিলেন নোবেল জয়ী অধ্যাপক জন ন্যাশের ভূমিকায়। ন্যাশ সিজোফ্রেনিক ছিলেন। তিনি তার শিশুদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলেন কারণ তার ভাষায় ঈশ্বর সেটা করতে বলেছেন।

২০০৪-এ সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনা লিন্দকে ছুরি মেরেছিল যে যুবক সেও দাবি করেছে যে ঈশ্বর তাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করেছে। তার নাম ছিল মিজালো। মিজালো কে আমরা এই দাবির জন্য সিজোফ্রেনিয়াক ভাববো কিন্তু একই রকম দাবি যখন পয়গম্বররা করছেন তখন তাদেরকে আমরা প্রেরিত পুরুষ জ্ঞান করেছি। কেন?

[4] অরেঞ্জ কাউন্টি রেজিস্টার, ৭/৫/০২, পৃষ্ঠা ১২১

সাইকিয়াট্রিক অ্যানথ্রোপলজিস্টরা নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। তারা বলছেন, একজন ব্যক্তি মানুষের হ্যালুসিনেশন বা ডিলিউশনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চালু হয়েছে নতুন নতুন ধর্ম। অর্থাৎ পয়গম্বরদের মানসিক বৈকল্যের কারণে ভুল দেখা ও ভুল শোনার উপর দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ধর্ম। তাদের এসব কথায় প্রথমেই বিশ্বাস করেছে তাদের পরিবারের সদস্যরা, বন্ধু-স্বজনরা, তারপর ধীরে ধীরে নানা অলৌকিকতার গাল-গল্পে সমর্থক-ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ধর্মটি একসময় রূপ পেয়েছে বিরাট প্রতিষ্ঠানের (তবে সবার প্রচারিত ধর্মই বড় হয় না, সবাই পয়গম্বর হিসেবে সফলও হয় না, তারা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের জনপদ থেকে এবং মানসিক ব্যধিগ্রস্ত হিসেবেই মারা যায়)[5]।

ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পয়গম্বর হয়ে ওঠার এই সাইকো-এ্যানালাইটিক্যাল ব্যাখ্যা আপনাকে এক কথায় মেনে নিতে হবে তা বলছি না। তবে টেম্পোরাল লোব, এপিলেপ্সি আর সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো পড়-ন, তারপর আপনার চেনা-জানা পয়গম্বরদের জীবনী গ্রন্থে আবার চোখ বুলান[6]। দেখুন ভুল দেখা, ভুল শোনর কত কথা রয়েছে পৃথিবীতে। তবে পয়গম্বরদের সবাই যে এপিলেপ্সি বা সিজোফ্রেনিয়ার রোগি ছিলেন তা না। কেউ কেউ পয়গম্বর হয়েছিলেন ফ্যাশনে কিংবা বংশ পরম্পরায়, স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য।

আরবে নবীদের জন্মহার হ্রাস বনাম পাপ-পূণ্যের হিসাব

প্রবন্ধের গোড়াতে বলেছি, আরবে নবী হওয়া ছিল ভীষণ ফ্যাশন। প্রতিবাদী তরুণ-যুবাদের বিদ্রোহের অংশ ছিল নবী হওয়া। নতুন ঈশ্বরের কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পুরাতন/প্রচলিত দেব-দেবীকে অস্বীকার আর রাজা-ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করা। কত নবী ছিলেন এরকম? মাওলানারা সুর করে বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, ভিন্নমতে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার।

---

[5] Littlewood, R. (1984) The imitation of madness: the influence of psychopathology upon culture. Social Science and Medicine, 19, 705-715.

[6] নবী মুহাম্মদের অধিকাংশ জীবনীকার মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করছিলেন স্বপ্নে কিংবা খিঁচুনির সময়। এপিলেপ্সির খিঁচুনি উঠলে মুহম্মদ (দঃ) ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেতেন, এবং হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেও ঘেমে উঠতেন (Martin Ling, op. cit, p.245)। যখন এ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠতেন, তিনি তার ওহী অন্যদের বয়ান করতেন। ইবনে সাদ-এর ভাস্য মতে মুহম্মদ ওহী নাজিলের সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং তার মনোসংযোগে বিগ্ন ঘটতো (Katib al Waqidi p. 37. *See also* Bukhari 1: 1: 2), কখনো বা মাটিতেও পড়ে আচ্ছন্ন যেতেন (*Bukhari 6, 60, 478*), কখনো বা তার ঘাড় এবং কাঁধ শক্ত হয়ে গিয়ে কাঁপুনি উঠত, আর তিনি তার স্ত্রীকে চাদর দিয়ে চাপা দিতে বলতেন (*Bukhari 6, 60, 478*, *Bukhari 9,78.111*)। মুহম্মদের অলীক শব্দ শোনা, অলীক বিভ্রম প্রভৃতি উপসর্গগুলো দেখে মনে হয় তিনি সম্ভবত এপিলেপ্সি কিংবা স্কিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত হতেন, যা বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝার মত অবস্থা সে সময়ে ছিল না। ডঃ গুস্তাভ ওইল (Gustav Weil) মুহম্মদের এপিলেপ্সির উপসর্গগুলো নিয়ে তাঁর '*Mohammed, der Prophet*" (Stuttgart, 1843)-এ আলোচনা করেছেন, যেগুলোকে মুহম্মদের প্রতি বিষেদগার হিসেবে প্রতিপন্ন করে মুসলিম সমালোচকেরা বাতিল করে দিতে চান।

বাইবেলের হিসাব যদি ধরি, তবে হযরত আদম থেকে হযরত ঈসার জন্মের মধ্যে পার্থক্য ৪ হাজার বছরের। যেহেতু নবী মুহাম্মদের পর আর কাউকে নবী স্বীকৃতি দেয়া হয় না সেহেতু এই বিপুল সংখ্যার নবীদের জন্ম হয়েছিল এই ৪ হাজার বছরের মধ্যেই। আরো ৫৭০ বছর পর একজন। সুতরাং নবী ঈসা পর্যন্ত গড়ে বছরে ৩০ জনের উপরে নবী আরবের ধূলোতে লুটোপুটি করেছেন। অসম্ভব নয়।

অনেক নবীর বাবা, দাদা নবী ছিলেন। ছেলে, নাতিরাও নবী ছিলেন। দুই/তিন ভাই নবী ছিলেন এমনও হয়েছে। শ্বশুর-জামাই নবী ছিলেন এও দেখা যায়। অনেকটা বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান-মেম্বার পদে প্রতিযোগিতার সময়কার সংবাদপত্রের হেডলাইনের মতো: শ্বশুর ও জামাতা উভয়েই চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। দু'জন দুই দল থেকে।

এসব নবীদের কেউ ভারতে বা চীনে জন্মান নি। রাশিয়ায় বা জাপানে জন্মান নি। অস্ট্রেলিয়ায় বা মেক্সিকোতে জন্মাননি। অন্তত: সেরকম কোনো উদাহরণ আমরা আরব অঞ্চলের ধর্মগ্রন্থগুলোতে পাই না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে এখন খোদ আরবও নবী পাওয়ার রহমত থেকে বঞ্চিত। কেয়ামত পর্যন্ত নবী হওয়া বন্ধ।

নবীদের জন্মহার কমে যাওয়ার কারণ কী? পৃথিবীতে পাপ ও পাপীর সংখ্যা কমে যাওয়া? দুনিয়ার সব মানুষ ধর্মপ্রাণ হয়ে পড়া?

ভারতের কাউকে (যেমন রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ) নবী বানানোর চেষ্টা না করাই ভালো। ভারতে আসতেন অবতার। একা বিষ্ণুই মৎস্য কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি-এই দশরূপে ধরায় এসেছেন। মজার বিষয়, এসব অবতারদের কেউ আরবে হেদায়েত করতে জন্মাননি। এমন কি, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা, আমেরিকাতেও তাদের জন্ম হয়নি। পথভ্রষ্ট মানব তখন কি শুধু ভারতেই ছিলো? হেদায়েত কি শুধু তাদেরই দরকার ছিল?

তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হেদায়েত কি এখন দরকার করে না? এখন কেন আবাবিল পাখি আসে না বুশের আর্মি থেকে ইরাককে মুক্ত করতে? এখন যখন সমকামীরা গির্জায় গিয়ে বিয়ে করে সংসার শুরু করে তখন লুতের সময়কার মত অভিশাপ নেমে আসে না। নুহের বন্যা হওয়ার মত পাপাচার কি তখনকার চেয়ে এখনকার মানুষ কম করছে?

এখনও কেউ নবীত্ব দাবি করলে তাকে আমরা ভন্ড ভাবি কেন? কোন মাপকাঠিতে তাহলে আগের এরকম দাবিদাররা উৎরে যান?

দীক্ষক দ্রাবিড়, ইন্টারনেটের বাংলা ব্লগে লিখে থাকেন। তার কিছু প্রবন্ধ মুক্তান্বেষা সহ বাংলাদেশের অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছে।